তারিখ ... পৃঃ ... কলাম ...

পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

মেজর আসলাম হায়দার, পিএসসি (অব)

স্কুলগুলোতে এখনও বোর্ডের বই পৌঁছায়নি। ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা প্রায় প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন স্থানে মিছিল-ঘেরাও নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেমেয়েদের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু দের বইপত্র নেই। শিক্ষকরাও ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে াছেন। তাঁরা তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের সময়মতো পাঠদান রতে পারছেন না। আর ক'দিন পরই পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে াবে। এক চরম হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক সকলে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এ অবস্থার হসাই কোন উন্নতির আশা নেই। এটা নতুন কোন ঘটনা য়। এ ঘটনা প্রতিবছর ঘটছে। ষড়ঋতু, মাস, বিভিন্ন রুত্বপূর্ণ রুটিন ঘটনার মতো এ সমস্যাও প্রতিবছর একই ময়ে একই গুরুত্ব নিয়ে আমাদের জীবনে ঘটছে। এ নিয়ে রও কোন বিকার নেই। সরকার, বোর্ড কারোরই নয়। ংশ্লিষ্ট সবাই ধরেই নিয়েছেন অন্য দশটি ঘটনার মতো টিও একটি রুটিন ঘটনা, যা আমাদের জাতীয় জীবনে বার ার আবির্ভূত হবে।

চিত্র শুধু বইপত্রের বেলায়ই নয়, শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে এই রাজক পরিস্থিতি বিরাজমান। ভর্তিযুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। ঙালীরা এখনও 'প্লাস পপুলেশনে' আছে। কাজেই বাবা-র তুলনায় সন্তান-সন্ততি প্রতিবছর যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে াতে সীমিত সংখ্যক স্কুল-কলেজে ঠাঁই করে নেয়া সম্ভব য়। তবুও যা আছে তাতে কোন শৃঙ্খলা নেই। তাই ভর্তির ময় রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বেই ভর্তি করা যায় ছেলেমেয়েকে ভাল কোন স্কুল অথবা লেজে। বেসরকারী পর্যায়ে নিয়মকানুনের কোন বালাই ই। শিক্ষা পরিণত হয়েছে এখন ব্যবসায়িক পণ্যে। ন্ডারগার্টেন, ইংরেজী স্কুলগুলো দেশের শিক্ষানীতির কোন োয়াক্কা করে না। এ সমস্ত স্কুলে প্রতিবছর নতুন ক্লাসে ভর্তি তে হয়। ছাত্রছাত্রীদের দিতে হয় সমস্ত ধরনের ফী। ছাড়াও আছে মোটা অঙ্কের ডোনেশন। বইপত্রের কোন দিষ্ট তালিকা নেই। জামায়াতঘেঁষা স্কুলগুলো ধর্মের নামে য়েকটি আরবী বই অতিরিক্ত সংযোজন করে দিয়েছে। ন্যদিকে ইংরেজী স্কুলগুলো দেশীয় সংস্কৃতির কোন ধার রে না। নিজেদের ইচ্ছামতো বইয়ের তালিকা নির্দিষ্ট করে চ্ছে। শিক্ষকদেরও কোন মান নেই। তাঁদের বেতনেরও ান সীমা নেই। এঁদের বেতন পাঁচ শত থেকে পাঁচ জারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আর ব্যবসায়ীরা, যাঁরা এ মস্ত স্কুলের মালিক, তাঁরা কামিয়ে নিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা। কৃত শিক্ষিত লোকগুলো এ ধরনের স্কুল-কলেজ খুলতে রেন না। কারণ স্কুল করার প্রাথমিক খরচ অনেক বেশি। াজেই এ ব্যবসায় নিয়োজিত হয়েছে কালোবাজারী, সোনা ারাচালানী ইত্যাদি পয়সাওয়ালা লোক। আর শিক্ষিত াকগুলো হয়ে যাচ্ছে ওদের বেতনভুক্ত কর্মচারী। মেধা বং বিবেক কোনটাই তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামতো ব্যবহার রতে পারছেন না। তাঁদের চলতে হচ্ছে অর্থলগ্নিকারী ঐ বসায়ীদের নির্দেশমতো। অনেক সময় চাকরির স্বার্থে ক্ষকরা অনেক অমানবিক আচরণ করতে বাধ্য হন পর্দার আড়ালে বসে থাকা ঐ ব্যবসায়ীদের চাপে।

অন্যদিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে অন্য ধরনের অরাজকতা। এখানকার শিক্ষকদের কোন মান নেই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ন্যূনতম অবকাঠামো নেই। এখানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয় ঐ স্বল্প শিক্ষিত যুবক, যারা জীবনের সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। যাদের জীবনে অন্য কোন চাকরিতে যাবার সুযোগ নেই তারাই এখানে শিক্ষক। তাদের অনেক শিক্ষকই তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্র। এরাই আবার সরকারী কোষাগার থেকে এক শ' ভাগ বেতন-ভাতা পাবার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে আল্লাহর ওয়াস্তে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা মাস গেলেই ব্যাঙ্কে চলে আসে। ঠিকমতো চাকরি করুক বা না করুক, পাঠদান করুক বা না করুক, তারা ব্যস্ত প্রাইভেট পড়ানো নিয়ে। বিভিন্ন কোচিং সেন্টার, নোট তৈরি করে দেয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁরা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন। নিজের প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের জন্য তাঁদের হাতে তেমন সময় থাকে না। তাঁর ওপর রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম। বিনা পয়সায় দেয়া বই, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য এবং বেতন-ভাতা নিয়েও চলছে নানা অনিয়ম।

শিক্ষাবোর্ডগুলো হচ্ছে অনিয়মের আখড়া। আদালত আছে বলে ন্যায়বিচারের ফাঁকফোকর দিয়ে বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা অনায়াসে বেরিয়ে আসেন। আবার বসে যান আপন চেয়ারে। প্রমাণ রেখে কেউ কখনও ঘুষ-দুর্নীতিতে লিপ্ত হয় না। কাজেই আদালত শত চেষ্টা করেও ওদের শাস্তি দিতে পারে না। বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে যে, একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে নানা ধরনের অপকর্ম সংঘটিত হয়েছে। যেমন প্রশ্নপত্র ফাঁস, নম্বর/ফলাফল উল্টাপাল্টা করা, মার্কশীট অদল-বদল ইত্যাদি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যস্ত রয়েছে শিক্ষানীতি প্রণয়ন নিয়ে। এটা একটা দুরূহ কাজ। সরকার তার ক্ষমতার সময়কাল শেষ করে ফেলেছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনও শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরা স্বাধীনতা-উত্তর বহুবার এ নিয়ে গবেষণা, আলোচনা, সমালোচনা করেছেন; কিন্তু শিক্ষানীতি— যা এ দেশের জন্য যুগোপযোগী তা প্রণয়ন করতে পারেননি। বিভিন্ন কমি হয়েছে, পণ্ডিত রাখা হয়েছে, সরকারী কোষাগার থে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে; কিন্তু এ দুরূহ কাজ সমাধা করতে পারা যায়নি। অবশ্য আমাদের দেশে কে কমিটি কোন দিন কোন সমস্যার সমাধান দিয়েছে ব দৃষ্টান্ত নেই। চা-পানি খাওয়া, গপসপ করা, সরকার বদ নতুন কমিটি গঠন ইত্যাদির মধ্যেই বাঁধা পড়ে আ আমাদের সমস্যাগুলো। অতি সাধারণ একটি বিষয় আমাদে বিজ্ঞ পণ্ডিতরা নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিভিন্ন ক্লাসে কি বই পড়ানো হবে তাই নির্দিষ্ট করতে পারেননি। তাই ে একই শহরে, একই গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে ভিন্ন ভিন্ন বি পড়ানো হয়। যেখানে সরকার ব্যর্থ হচ্ছে নিয়মকানুন প্রণ করতে, সেখানে অশিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত শিক্ষা ব্যবসায়ীদে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই।

যে বই ছাপা এবং তা ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছানো নি এত হৈচৈ হয় এবার নাকি তা ছাপার দায়িত্ব পেয়েছে দেশের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী। সত্যিই যদি তাই হ তাহলে মনে প্রশ্ন জাগে, কেন তাঁকে এ contract দে হলো। তিনি তো নিজে এ কাজ করবেন না এবং করেনওনি। তিনি সাব-কন্ট্রাক্ট দিয়ে দিয়েছেন। তি কমিশন পেয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এখ ছাত্রছাত্রীরা বই পাক আর না পাক তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না। তিনিও সবার প্রাপ্য নিশ্চয় সবাইকে পৌঁ দিয়েছেন। অতএব কেউ তাঁর টিকিটিও ছুঁতে পারবে ন তিনি নিশ্চিন্ত।

আমরা প্রায়ই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলি। কিন্তু কা কখনও তা করি না। সবকিছুই এক জায়গায় কুক্ষিগত ক রাখি। বই ছাপানো এবং বিতরণ ব্যবস্থাও দেশের বিভি স্থান থেকে করা যেত। তাতে একজন কন্ট্রাক্টরের ওপর চা পড়ত না। আবার সময়ও কম লাগত। বইও ঠিক সম ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছত। এখনকার মতো এমন সংগ্রা মিছিল করতে হতো না।

এ ঘটনা বা পরিস্থিতি এভাবে শান্ত হবে না। পূর্ব অভিজ্ঞ বলে; এ ধারা চলতে থাকবে দীর্ঘদিন। বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণা এটা সামাল দিতে পারবে না। সমস্যা আরও গভীর হবে তারপর এক সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমস্যার হাল কর জন্য এগিয়ে আসবেন। সকলকে একত্রিত করা হবে; ত পর খুঁজে পাওয়া যাবে এর বিহিত। এই-ই হলো আমাদে ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা। ততদিনে যা ক্ষতি হওয়ার তা হ যাবে। সম্ভবত আমাদের প্রতিরোধক্ষমতা অন্যদের তুলন অনেক বেশি। প্রতিনিয়ত যে শারীরিক ও মানসিক চা সইতে হয় তাতে সমগ্র জাতিই অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কথা

প্রকৃতপক্ষে সমস্যা সমাধানের জন্য অমুক নীতি, তমু নীতি, কমিটি গঠন ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। তাতে কে ফল হয় না। নীতি প্রণয়ন করার পর নির্ধারকরা আর একবার নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন, নীতির কোন ধা তাঁদের স্বার্থের হানি করে কি না তা দেখার জন্য। দেশে মোক্ষম সময় চলে গেছে নীতি নির্ধারণ করতে। নীতি প্রণয়ন করা হয়নি, প্রচলনও করা যায়নি। দেশ চলছে এডহ ভিত্তিতে। যতদিন এর প্রণয়ন এবং প্রচলন না হচ্ছে, ততদি অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন/পরিবর্ধন করে কাজ চালিয়ে নেয়া যেতে পারে তাতে সাফল্য আসবে কোন সন্দেহ নেই।